International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-VII, August 2016, Page No. 38-44
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহুমাত্রিক সঙ্গীত প্রতিভা

অমিত দে
এম.এ, পি.এইচ.ডি, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

Abstract

D.L.Roy (1963-1913) *is a bright star in the sky of Bengali literature. In a life span of only 50 years he created spontaneously the diverse genres of Bengali literature. He was a poet, music composer, lyricist & a famous dramatist. His extraordinary music talent mesmerised the people of Bengal. He learnt & practiced the Indian classical music & side by side brought the European style of music to Bengali songs. Besides, there has been easy entrance of the features of the Baul songs, Bhatiali, Kirtan, Toppa, Kheyal, Thumri in his compositions. His great family tradition worked behind his philosophy of music. He got his first lesson on music in his child-hood from his father Kartikeya Ch. Roy. Besides, family tradition the frequent communicarion with the eminent literary circle of Bengal consisting of Bankim Chandra, Dinabandhu, Akshaykumar & Bidyasagar built up a strong cultural spirit in him. He is the actual pioneer of humorous songs in Bengali. These songs were highly popular. Whenever he went to the stage to sing, there came requests from all comes for a humorous song. His patriotic songs were a source of inspiration to the thousands of youths of his time. Once Bangabandhu Sekh Mujibur Rahman saluting the ground at the gate of Dhaka prison sang out "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি" (As I was born in this country, I wish to die here) – a popular song composed by D.L.Roy.*

Key words: extraordinary music talent, diverse genres, family cultural spirit.

বাংলার এক বিস্ময়কর প্রতিভা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর গীতরচনা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। বহু ধরনের গীত রচনা করেছেন তিনি। সারা জীবনে প্রায় ৫০০টি গান[১] রচনা করেছেন। কবি, নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভালোবেসেছেন বাংলাকে, বাংলার মানুষকে। কোন অর্থকরী কারণে তিনি সঙ্গীত রচনা করেননি। গভীর জীবনবোধ থেকে উঠে এসেছিল তার সঙ্গীতগুলি। সেখানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেমন ব্যঙ্গ রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালী তাঁর গানে উদ্বেলিত হবে, প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাবে। জন্মের সার্ধশতবর্ষে পৌঁছে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত প্রতিভার বিচিত্র দিক্ ফিরে দেখা যেতে পারে। শুধু পুরনোকে ফিরে দেখা নয়, পুরনোকে আঁকড়ে বর্তমানের মূল্যবোধ তৈরি করা - তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া।

একটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয় - 'ছেলেবেলা থেকেই এক সাঙ্গীতিক পরিবেশে প্রতিপালিত হন দ্বিজেন্দ্রলাল; যা তাঁর পরবর্তী সঙ্গীত জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে'।[২] নদিয়ার কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির দেওয়ান ছিলেন কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। দ্বিজেন্দ্র জন্মের শতখানেক বছর আগে ছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল। মদনগোপাল ছিলেন তার সেনাপতি, আর বড়ো ভাই রামগোপাল দেওয়ান। এই দেওয়ান পরম্পরায় পরপর এলেন রাধাকান্ত, উমাকান্ত ও কার্তিকেয়চন্দ্র মহাশয়। বঙ্গগৌরব রামতনু লাহিড়ি ছিলেন রাধাকান্ত রায়ের

প্রথম কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবীর ছেলে। মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য পরিবারের মেয়ে। অশাধারণ বংশগৌরবের মহিমা নিয়ে ৪ শ্রাবণ ১২৭০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯ জুলাই ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পিতামাতার সপ্তমপুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ছোটবেলা থেকেই গান শিখতেন বাবা কার্তিকেয়চন্দ্রের কাছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাঠ নিতেন। 'দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে ছিলেন সুগায়ক। প্রথম জীবন থেকেই বিভিন্ন সভাসমিতিতে তিনি স্বরচিত গান শোনাতেন'।[৩] রামতনু লাহিড়ি জানিয়েছেন, 'তাঁর কণ্ঠ ছিল সুমধুর'।[৪] সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি, সংস্কৃত ও পার্সি ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। সঙ্গীত শিক্ষা ও ভাষাশিক্ষা চলেছিল সমানতালে। তাঁর পরিবারের সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা মানুষ বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের সঙ্গে ছিল নিবিড় যোগাযোগ। কাজেই এমনই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে থেকে মাত্র ১৯ বছরে "আর্যগাথা" (১৮৮২) নামের গানের বই প্রকাশ করাটা বিচিত্র কিছু ছিল না। প্রেম ও ভগবৎ দর্শন এ কাব্যের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। ভগবদভক্তির বীজ যে কৈশোরেই তাঁর চিত্তে অঙ্কুরিত হয়েছিল তার আভাস "আর্যগাথা" প্রথম ভাগের নানা গানে পাওয়া যায়। ১২ - ১৭ বছর বয়সের মধ্যে লেখা গানগুলিতে প্রেমের পরিনমণ (maturity) আমাদের মুগ্ধ করে। "আর্যগাথা"-র একটি গানে কবি লিখছেন-

" এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাসি-
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় ! ধরে না ধরে না তায়-
অকূল অসীম প্রেমরাশি ।
... ...
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি ভালোবাসা,
জন্ম-ঋণ করি' পরিশোধ"।

ভারতীয় প্রেম এমন আত্মসমর্পণকেই দাবী করে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্র প্রেমের নিগূঢ় বাণীর কথা। 'সোনার তরী' কাব্যের "বৈষ্ণব কবিতা'-য় তিনি বললেন -

"দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে—আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"। [৫]

রবীন্দ্রনাথের জন্মের দু'বছর পরে জন্মেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, কিন্তু মৃত্যুবরণ করেন রবীন্দ্রপ্রয়াণের আটাশ বছর আগে। পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবনে বাংলার সাহিত্যাকাশে যে রঙ দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তা ঈর্ষণীয়। রবীন্দ্র সমসাময়িককালে সাহিত্যচর্চা করলেও প্রথম থেকেই দিগন্তপ্রসারী রবীন্দ্রপ্রভাববলয় থেকে মুক্ত হবার যে ক'জন সাধনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) অন্যতম। গীতিকার ও নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি সমধিক, কবি হিসাবেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। বস্তুত, তাঁর কবিতা ও গানের যুগলবন্দী একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে শনাক্ত করা যায় না। বাঙালি সঙ্গীত পিপাসুদের কাছে বহুল উচ্চারিত 'পঞ্চগীতিকবি'-র অন্যতম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অন্যরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ও রজনীকান্ত সেন। অনুমান করা যায়, তিনি কোন্ মাত্রার ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ছোটবেলা থেকে যে সঙ্গীত চর্চার মধ্যে বড় হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, বিলেতে গিয়ে সে ঘরানাটা একটু বদলে গেল। লন্ডনে থাকার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক কবিতা লিখেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সেগুলি একত্রে গ্রন্থরূপে প্রকাশ পায় - 'The lyrics of Ind' নামে। এটাই তাঁর প্রথম ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ। ইংলন্ডে থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে ইংরেজি গানের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনীহা ছিল। তবে বিলাতে যাবার পর সে ঘৃণা ভালোবাসাতে পরিণত হয়। এমনকি পয়সা দিয়েও ইংরেজি গান শিখলেন। অনুবাদ করেছেন বহু ইংরেজি ও

আইরিশ গান। অনুবাদগুলি ছিল একেবারে আক্ষরিক। দ্বিজেন্দ্রলাল স্কচ্, ইংরেজি ও আইরিশ গান অবলম্বনে 'আর্যগাথা ২য় ভাগ' গ্রন্থে ৩৫ টি গান রচনা করেন। সমসাময়িককালে রবীন্দ্রনাথও বিলাতে ছিলেন। তিনিও ইংরেজি, স্কচ্ ও আইরিশ গানে মুগ্ধ ছিলেন, তবে তাদের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, সেই গানের সুরে নতুন বাণী বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দু'জনেই দেশে ফিরে বাংলাগানে বিলিতি সুরের প্রয়োগ করেন। তবে স্বতন্ত্র ধারায়। রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করেন গীতিনাট্য রচনায় আর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে ব্যবহার করেন হাসির গানে, পরে তা ফুটে ওঠে মধ্যজীবনের স্বদেশি গানে এবং শেষজীবনের নাট্যসঙ্গীতে। আসলে বিলিতি সঙ্গীত তার জীবনভাবনার পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিল। 'ইংরেজি ও হিন্দুসঙ্গীত' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন "কি করুণ, কি প্রেম, কি হাস্য, কি বীর, সব রসই ইংরেজি গানে সাজে"। পাশ্চাত্যের বিঠোফেন, ভাগনার, মোৎসার্ট প্রমুখদের মতো সুরকার যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন গায়কী।

সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করাই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের গানের কেন্দ্রীয় প্রবণতা। বিলেত থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ফেরার সময়কালে বাংলার বুকে ভাবস্থবিরতা ঘটেছিল। চারিদিক থেকে ন্যাকামির ভাবপরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল। সেই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল humour বা ব্যঙ্গ এদেশে আমদানি করে তার সঙ্গে দেশীয় প্রেমের মাদকতা মিশিয়ে বিলিতি ঢঙের সুরে হাসির গানের প্রচার করলেন। বাঙালীর মনে একটা ভাববিপ্লব ঘটল।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান কৃতিত্ব হাস্যরসের সঙ্গীত নির্মাণে। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ হাস্যগীতির স্থাপয়িতা ছিলেন। বলা যেতে পারে, 'বাংলা সঙ্গীতের হাসির গানের সম্ভারে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদানই সর্বাধিক'।[৬] এই সমস্ত গানগুলিতে ধরা পড়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের সমাজচেতনা ও দেশাত্মবোধ, রঙ্গগীতিতে ধরা পড়েছে তাঁর মর্মগত প্রেম-ভালোবাসা-মুগ্ধতা-সৌন্দর্যবাসনা। তাঁর হাসির গানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কালিদাস রায় বলেছেন –

> *"নন্দলাল, পাঁচশো বছর, গীতার আবিষ্কার ইত্যাদি হাসির গানের সুরে এমন একটা সবল গতিপ্রবাহ পরিস্ফুট হল যে, সকলে বুঝতে পারল এদেশে এই সুরধারার প্রবর্তন সম্পূর্ণ নূতন। কবি নিজে যখন এই গান গাইতেন তখন হাসতে হাসতে সকলের বুকে পিঠত খিল ধরে যেত। তা কি শুধু কথার জন্যে? দরাজকণ্ঠে উদীরিত সুরের জন্যই প্রধানত: গানগুলি শুধু পড়লেই হাসি পায়। আবৃত্তি শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়তে হয়। সুরকার নিজে যখন গাইতেন তখন অট্টহাস্য রোধ করা কঠিন হত"।* [৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাসির গানের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 'পূর্ণিয়া মিলন', 'খামখেয়ালি সভা'য় তিনি হাসির গানের বন্যা বইয়ে দিতেন। তাতে গলা মেলাতেন রবীন্দ্রনাথ আর তার অন্যতম সহায়ক ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। লোকে তাঁর হাসির গানে এতটাই মজে ছিল যে, দ্বিজেন্দ্রলাল গান গাইতে উঠলেই সকলে 'হাসির গান দ্বিজুবাবু, একটা হাসির গান !' [৮] বলে চিৎকার করে উঠতেন। নরনারীর প্রেম থেকে সমাজের নির্মম সত্য কোনটাই বাদ যায়নি দ্বিজেন্দ্রলালের গানে। নির্মল কৌতুকের আবরণে দ্বিজেন্দ্রলাল তুলে ধরেছেন নির্মম সমাজসত্যকে। মনে পড়ে যায়, 'নন্দলাল' শীর্ষক কবিতাটি। ঠুনকো স্বদেশপ্রেম ও সমাজকল্যাণ বাসনা ব্যঙ্গের কষাঘাতে সেখানে জর্জরিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সুরকার হিসাবে কীর্তন, বাউল, খেয়াল, টপ্পা ও ধ্রুপদের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে সুর দিয়েছেন। হিন্দুস্তানী ওস্তাদী থেকে যতটুকু নেওয়ার নিয়েছিলেন। তারপর বাংলার নিজস্ব সুরধারার সঙ্গে ওস্তাদী ধারা মিলিয়ে নতুন সুর সৃষ্টি করলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাব্যসঙ্গীতগুলিকে বিভিন্ন রাগের আদর্শে সুরারোপিত করেন। যেমন- 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে' (দেশ), 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে' (জয়জয়ন্তী), 'তোমারেই ভালবেসেছি আমি' (দরবারি কানাড়া), 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে' (নটমল্লার) ইত্যাদি। আবার তাঁর জনপ্রিয় স্বদেশী গানগুলিকেও তিনি বিভিন্ন রাগের ঠাটে নিবদ্ধ করেছিলেন। যেমন- 'ধনধান্যপুষ্পভরা' (কেদারা), 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' (ভূপ-কল্যাণ), 'মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়' (ইমনকল্যাণ) ইত্যাদি"।[৯] 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গানটিতে বাউল ও কীর্তনের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন বিলিতি গান প্রথাগতভাবে শিখেছিলেন বিলাতে থাকাকালীন, তেমনই খেয়াল ও টপ্পার প্রথাগতভাবে তালিম নিয়েছিলেন। সেই সময়ের বিখ্যাত খেয়ালগায়ক সুরেন্দ্রনাধ মজুমদারের আত্মীয় ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর কাছেই তালিম নিয়েছিলেন। প্রাক্-দ্বিজেন্দ্র যুগে টপ্পা বা টপ্পাঙ্গ সুরের একাধিপত্য চলছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ঘুরিয়ে দিলেন সেই ধারাকে। টপ্পার পাশাপাশি তিনি খেয়াল এবং টপ-খেয়ালের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য বাংলা প্রেমগীতিতে সংযুক্ত করেন। তাঁর গানে লোকসঙ্গীতেরও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। দ্বিজেন্দ্রগীতির প্রধান অবলম্বন ছিল রাগসঙ্গীতের রূপবন্ধ। 'এস প্রাণসখা এস প্রাণে', 'আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি', 'তোমারই ভালোবেসেছি আমি' গানগুলির সুরসৃষ্টিতে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

বাংলা প্যারডি গানের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অসামান্য। তিনি অনেক বিখ্যাত গান ও কবিতা অবলম্বনে উৎকৃষ্ট প্যারডি রচনা করেন। "হাসির গান"-এর 'এস এস বঁধু এস' গানটি একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব পদের ব্যাঙ্গানুকৃতী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যের 'তোমরা ও আমরা' কবিতা ভেঙে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন দুটি সার্থক প্যারডি 'আমরা ও তোমরা'। উদাহরণ না দিলে তার চমৎকারীত্ব বোঝা যাবে না। 'সে আসে ধেয়ে' একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের লালিকা; রচনা: শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; কণ্ঠশিল্পী: শ্রী অলক রায় চৌধুরী –

"সে আসে ধেয়ে
এন, ডি, ঘোষের মেয়ে ।
রিনিক ধিনিক রিনিক ধিনিক
চায়ের গন্ধ পেয়ে ।
কুঞ্চিত ঘন কেশে
বোম্বাই শাড়ি বেশে
খটমট বুট শোভিত পদ
সুবিদিত ম্যাটিনেই ।
বঞ্চিত নহে শরবৎ-কেক
বিস্কুট তায় প্লেটে ।
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে
রুমালেতে মুখ মোছে ।
জবাকুসুমের গন্ধ আসিছে
ড্রইংরুমটি ছেয়ে"। [১০]

স্বদেশভাবনার অন্যতম পূজারি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ভালোবাসতেন নিজের দেশকে। বিলেত থেকে কৃষিবিদ্যার ডিগ্রী লাভ করে সরকারি দফতরে কাজ করতে লাগলেন। পরবর্তীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কাজে যোগ দিলেন দিনাজপুরে। কিন্তু স্বাদেশিকতায় বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁকে বারবার বদলি হতে হয়েছিল। সাহিত্য নির্মাণে বাধা পড়তে থাকে। মনের চাপা কষ্ট হতে সৃষ্টি হতে থাকে নানা রকমের সঙ্গীত। এই সময়কার সঙ্গীতগুলিতে দেখা গেছে অনবদ্য স্বদেশ ভাবনা। ১৯০৬ সালে গয়াতে বদলি হলে সেখানে রচিত হয় 'বঙ্গ আমার জননী আমার...' সঙ্গীতটি। এ সময়কালেই রচিত হয় তাঁর দুটি বিখ্যাত নাটক 'মেবারপতন' ও 'নূরজাহান'।

জাত্যাভিমানী এই মানুষটি ইংলন্ডে গিয়েও ভারতীয় আদব-কায়দাকে ভুলে যাননি। কোট প্যান্টের বদলে ধুতি, পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াতেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীন এই মানুষটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। খালি পায়ে, আলুথালু বেশে, উস্কোখুস্কো চুলে গানের দল নিয়ে কলকাতায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলম ধরে লিখলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গানটি –

" ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা।"

তিনি প্রায় পঞ্চাশটির মত স্বদেশভাবনামূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন। এই গানগুলি মূলত: কোরাস জাতীয়। মঞ্চে গাওয়া হলে এক উদাত্ত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হত। স্বদেশ বিষয়ক সঙ্গীত রচনাতে তিনি অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করেছিলেন। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুরের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধনধান্য পুষ্পভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' ইত্যাদি স্বদেশ বিষয়ক সঙ্গীতে। রবিজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্র জীবনীকাব্য"-তে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার' সঙ্গীতটিকে অধিক জনপ্রিয় বলেছেন। অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৩ এর ষষ্ঠ দিনে বুধবার বিকেল ৪ টায় মেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; সার্ধশত জন্মবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি' শীর্ষক সেমিনার, সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক পবিত্র সরকার। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"স্বাজাত্যবোধ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সংকীর্ণ করেনি, বরং বিশ্ববোধের সঞ্চার করেছে। পুরাণকে তিনি অন্বিত করেছেন সমকালীন যুগযন্ত্রণার সঙ্গে। রবীন্দ্রসমকালে শিল্প সৃষ্টি করে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ঘরানার জন্ম দিয়েছেন। শুধু সার্ধশত জন্মবর্ষে নয়; দেশপ্রেমে-নতুন ধারার কাব্য-নাটক-গানের সূত্রে তিনি আমাদের নিত্য স্মরণীয় নাম।" [১১]

তাঁর স্বদেশ বিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে পাওয়া যায় একটা 'ইনস্পিরেশন'। বহু মহান ব্যক্তিত্ব তার গান শুনে আনন্দ পেতেন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, লোকেন্দ্র পালিত, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মহামানবেরা তাঁর গান শুনে আনন্দ পেতেন। পুত্র দিলীপ কুমার রায় পিতার গান শুনে জগদীশ বসুর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এইভাবে –

"আচার্যের মুখের চেহারাই বদলে গেল। গানের শেষে উঠে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন: 'বড় আনন্দ দিলে আজ দিলীপ! কত কথাই যে মনে পড়ে.....আহা কী সব গানই তিনি বেঁধে গিয়েছিলেন।" [১২]

মহামনস্বী লোকেন্দ্রনাথ পালিত 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি শুনে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলেছিলেন :

"On how wonderful! How magnificent! Let me confess my dear Dwiju, it's undoubtedly the very-very-very best and noblest national song that I have ever heard or read in my life! It's, indeed, a divine inspiration!" [১৩]

ঋষি অরবিন্দ ঘোষ 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানটির ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বব্যাপী। কবিতার প্রথম অংশের কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ তুলে ধরা হল :

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সেকি মা হর্ষ।
সেদিন তোমার প্রভায় ধারায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, জয় মা জননি। জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, 'জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

শ্রী অরবিন্দের অনুবাদ

Mother India, when thou rosest
From the depth of oceans hoary

Love and joy burst forth, unbounded,
Life acclaimed thee in thy glory
Darkness fled before thy splendor
Light its radiant flag unfurled;
All acclaimed thee's "Hail o Mother,
Fosterer, Savior of the world"
Earth became thrice- blessed by the
Rose of beauty of thy feet
Blithe, she chanted: 'Hail world charmer
Hail world Mother….. Thee I greet.' [১৪]

বাংলার হাজার হাজার তরুণ-তরুণী তার গানে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান গেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের গান। 'শিলালিপি' পত্রিকায় মুহম্মদ সবুর লিখেছেন –

"ঢাকা কারাগারের সামনে মাটি স্পর্শ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভরাট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'এই দেশেতে জন্ম আমার, যেন এই দেশেতেই মরি।' সারা বাংলা যেন সেই সঙ্গে গেয়ে উঠল_'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।' সেই ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় প্রকম্পিত সারা বাংলা 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব' স্লোগানে। গণরোষে ভীত পাকিস্তানি জান্তা শাসক কারাগারে আটকে রাখার সুযোগ পায়নি। লাখো ছাত্র-যুবা-জনতা কারাগারের সামনে। বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে এসে একটু মাটি তুলে নিলেন হাতে। বঙ্গবন্ধুর সেই উচ্চারণ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। ঊনসত্তর-সত্তর ছাড়িয়ে একাত্তরে আরো তীব্র হয়ে উঠল বাঙালির বাঁচা-মরার প্রশ্ন। মুক্তির গানে জয়ধ্বনিত হতে থাকে 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা', যাকে রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিলেন ৩০ লাখ মানুষ এবং তিন লাখ মা-বোন। যুদ্ধজয়ের সেই দিনে আরো ধ্বনিত হয়েছিল, 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ। কেন গো মা তোর ধুলায় মলিন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।" [১৫]

১৯১৩ সালের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের দু'জন দিকপালের নাম। তাঁরা দু'জনই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সাথে জড়িয়ে আছেন। এঁদের একজন বর্তমান জাতীয় সংগীতের রচয়িতা এবং অন্যজনের রচিত দেশাত্ববোধক গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত। প্রথম জন হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিতীয় জন হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৯১৩ সালের ১৭ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে – 'Man must die but his deeds will never die'। মহান দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে তার আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ দিকে দিকে যেভাবে সমাজ অবক্ষয়ের পথে চলেছে তাতে আমাদের মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে, জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করতে হলে প্রয়োজন দ্বিজেন্দ্রলালের সেই গানটি-

"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।"

তথ্যসূত্র :

১. *চক্রবর্তী সুধীর,* সংকলিত ও সম্পাদিত, *"দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র"*, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা অকাদেমি, পৃ. ৭।
২. *ভারতকোষ, ৩য় খন্ড,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১১১।
৩. *চক্রবর্তী সুধীর,* সংকলিত ও সম্পাদিত, *"দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র"*, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা অকাদেমি, পৃ. ৩৫।
৪. *শাস্ত্রী শিবনাথ, "রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", 'শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসুর পত্র'*, ২য় সংস্করণ, ২০০১ মূদ্রণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. , কলকাতা।
৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', "রবীন্দ্ররচনাবলী - ১", জুলাই ১৯৮০, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৬২।
৬. *ভারতকোষ, ৩য় খন্ড,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১১১।
৭. *ঘোষ বিশ্বজিৎ, "সঙ্গীতসাধক দ্বিজেন্দ্রলাল"*, 'লেখালেখি', সাহিত্য দেওয়াল, পৃ. ২।
৮. *রায় দিলীপ কুমার, "মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল",* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬, পৃ. ৯৪।
৯. ভারতকোষ, ৩য় খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১১১।
১০. ইউটিউব, ৩০ মার্চ, ২০১২, upload by Shatadru , কণ্ঠশিল্পী শ্রী অলক রায় চৌধুরী।
১১. *সরকার পবিত্র,* সভাপতির ভাষণ (অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৩, ষষ্ঠ দিন), 'সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন' পত্রিকা, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩।
১২. রায় দিলীপ কুমার, "মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬, পৃ. ৯৫।
১৩. রায় দিলীপ কুমার, "মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬, পৃ. ৯৫।
১৪. *মন্ডল বাসুদেব, "দ্বিজেন্দ্রলাল"*, 'লেখালেখি', সাহিত্য দেওয়াল, পৃ. ৮।
১৫. *সবুর মুহম্মদ, "দেশপ্রেম ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান",* 'শিলালিপি' পত্রিকা, ১৫/০৭/২০১১।

** উদ্ধৃত দ্বিজেন্দ্রগীতি সমূহ *"দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র", পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি* হতে গৃহীত হয়েছে।